দুর্গাপূজা এখন কেবলই উৎসব

ইরানী বিশ্বাস

বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গসহ পৃথিবীর যে প্রান্তে বাঙালির বসবাস, প্রায় সবখানেই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বছরের এই সময়টাতে নানাভাবে, নানা ভঙ্গিতে বাঙালি হিন্দুরা উৎসব উদ্‌যাপন করে। শারদীয় দুর্গাপূজা সাধারণত পারিবারিক, বারোয়ারি, সর্বজনীন হয়ে থাকে। বিশ্বকর্মা পূজায় ঢাকে বাড়ি পড়তেই মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। শরতের নীল আকাশের সাথে মিলিয়ে যাওয়া কাঁশবন হাওয়ায় দুলতে দুলতে হাতছানি দিয়ে ডাকে। বাড়ির ছোটদের পড়ায় আর মন বসে না। ফেলে আসা পূজার দিনের স্মৃতি মেঘের ভেলায় সওয়ার হয়ে ছুটে বেড়ায়।

আগেকার দিনে অস্থায়ী মন্দিরে পূজা খুব কম হতো। দুর্গাপূজা মূলত বড়লোকি পূজা। জমিদার, বড়লোকেরা এ পূজা করতো। আষাঢ়ে রথের দিনে খুঁটি পূজা করা হতো। সেদিন মন্দিরে পুরোনো প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে নতুন করে ঘট স্থাপন করা হতো। এরপর প্রতিমা বানানোর শিল্পী আসতো বাড়িতে। খড় দিয়ে বানানো হতো প্রতিমার কাঠামো। দূর থেকে আনা হতো মাটি। এই মাটির সঙ্গে পাটের কুচি, ধানের তুষ মিশিয়ে করা হতো প্রতিমা বানানোর উপযুক্ত। এরপর একদিন বাড়ির সকল এঁয়োতি বউরা পূজা দিতে আসতো। শুরু হতো প্রতিমার কাঠামোতে মাটির প্রলেপ। মন্দিরের সামনে রাখা থাকতো একটা ঢাক আর কাঁসর। অনেকেই শখের বসে বাজাতো। অনেকে প্র্যাকটিসও করতো।

এভাবেই একসময় শুরু হতো মহালয়া। বিকেলে বাড়ির রেডিও পরিস্কার করে নতুন ব্যাটারি লাগানো হতো। পঞ্জিকা দেখে সময় নির্ধারণ করা হতো সকালে কখন মহালয়া শুরু হবে। তখনকার দিনে অ্যালার্মের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু বয়স্করা কিভাবে যেন ঠিক সময়ে উঠে যেতেন। সকলে মিলে আকাশবাণী কোলকাতায় প্রচারিত মহালয়ার চণ্ডীপাঠ শোনা হতো। সুরেলা কণ্ঠে চণ্ডী পাঠ আর গানের সুরে মনে হতো সত্যি যেন কৈলাশ থেকে দেবী দুর্গা নেমে এসেছেন। বাড়ির পরিবেশ নিস্তব্ধ হয়ে যেত। একটু আলোর রেখা ফুটে উঠতেই দৌড়ে যেতাম শিউলি তলায়। হলুদ বোটায় সাদা পাপড়ির সুঘ্রাণযুক্ত ফুলগুলো পূজার আগমনী বার্তা দিচ্ছে। সাবেকি পূজায় ঢাকের বাজনা তার সাথে ধূপ-ধুনার গন্ধ এক অন্য রকম স্বর্গীয় পরিবেশ তৈরি করতো।

অষ্টমি পূজায় অঞ্জলি দেওয়া এক মজার ব্যাপার ছিল। এ দিনে কুমারি পূজা একটি ভিন্নমাত্রা যোগ করে। নবমি পেরিয়ে দশমিতে বিসর্জন। এক বছরের পূজার আনন্দ যে এ দিনেই শেষ হয়ে যেত। তবু দশমির বিকালে নৌকা বাইচ উপলক্ষ্যে নদীর পাড়ে মেলা বসতো। দিন শেষে মিষ্টি-মণ্ডা, হরেক রকমের তেলেভাজা এবং সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটা করে সকলে বাড়ি ফিরতেন। গুরুজনদের প্রণাম করে আশির্বাদ নেওয়া হতো। বড়রা মিষ্টিমুখ করিয়ে প্রণামী দিতেন। বাঙালি বনেদি বাড়িতে পূজার বাড়তি আনন্দ হিসেবে থাকতো গানের জলসা, যাত্রা-থিয়েটার। পূজা উপলক্ষ্যে শারদ ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতো। নতুন সাহিত্য প্রকাশনা যেমন উপন্যাস, গল্প, কবিতা, ছড়ার বই প্রকাশিত হতো। সেইসঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানি পূজার গানের অ্যালবাম প্রকাশ করতো।

দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসবে পরিণত হয়েছে বহুকাল আগেই। এখনকার দিনে পূজায় যতটা না ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বা পবিত্রতা রয়েছে তার চেয়ে উৎসবের আমেজটা একটু যেন বেশিই রয়েছে। এখন দুর্গাপূজা মানে শুধু প্রতিমা দেখা, আর মিষ্টি-মণ্ডা, মুড়ি-মুড়কি খাওয়া নয়। প্রতিবছর পূজা উপলক্ষ্যে ফ্যাশন হাউসগুলো নতুন ট্রেন্ডের পোষাক বাজারে আনে। সংবাদপত্রগুলো আলাদা করে ম্যাগাজিন বের করে। টেলিভিশনগুলো পূজা উপলক্ষ্যে আলাদা নাটক, সেলিব্রেটি আড্ডা, গানের প্রোগ্রাম, বিভিন্ন ধরনের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান তৈরি করে থাকে। এমনকি নতুন সিনেমা মুক্তি দেওয়া হয়। নতুন রেসিপি আনা হয় পূজা উপলক্ষ্যে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান এখন বাণিজ্যিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

মহালয়ার চণ্ডী পাঠে শুরু হচ্ছে এখন পূজা। এ সময় থেকেই সকলের মধ্যে পূজা উদ্‌যাপন নিয়ে হৈ হুল্লোড় শুরু হয়ে যায়। পূজা উদ্‌যাপনে আলোক সজ্জা, প্রতিমা তৈরি, মণ্ডপ তৈরিতে শৈল্পিকতা যোগ হয়েছে। পূজা মানে এখন শুধু দুর্গার পরিবার নয়। এর সাথে যোগ হয়েছে থিম পূজা। মানে এক একটি পূজার জন্য বেছে নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন থিম। কেউ শঙ্খ থিম বেছে নিয়ে পুরো মন্দিরটাই শঙ্খ আদলে তৈরি করছে। কেউ ধুনচির মতো, কেউ কোনো হাসপাতালের মতো, কেউ পুরোনো দিনের কোনো স্থাপনার আদলে বানাচ্ছে। শুধু মণ্ডপ বা প্যান্ডেলেই নয়, বৈচিত্র্য আনা হচ্ছে প্রতিমার ক্ষেত্রে। বর্তমান সময়ে দুর্গা প্রতিমার মুখভঙ্গিতে এসেছে নতুন উপস্থাপনা। দুর্গা প্রতিমা বানানো হচ্ছে মাদার তেরেসা রূপে, কখনো সাধারণ গায়ের বধূ রূপে, কখনো কর্মজীবী নারী রূপে। দেখা যায় অসুরের নাটকীয় আগমন। লক্ষী, স্বরস্বতী, কার্তিক, গনেশের উপস্থিতিও ভিন্নরকম। এর সঙ্গে রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, যাত্রা, নাচের প্রতিযোগিতা, ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা। প্রসাদেও রয়েছে বৈচিত্র্য। অধিকাংশ পূজা প্যান্ডেলে সাধ্যমতো আপ্যায়নের করা হয়। তবে এখন মিষ্টি-ফলের পরিবর্তে দেওয়া হচ্ছে খিচুড়ি, পোলাও।

পূজার ছয় দিনে কে কোন পোশাক পরবে তা নিয়ে চলে আলোচনা। এ বেলা ও বেলা, কে কোন পূজায় কি রং পরবে, কেউ সাবেকি সাজে, কেউ নতুন ডিজাইনের পোশাক; এসব নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। সেই সঙ্গে খাবারের ব্যবস্থায়ও রয়েছে ভিন্নতর উপস্থাপনা। দুর্গা পূজারও যে থিম হতে পারে, প্যান্ডেল থেকে শুরু করে প্রতিমা, আলোকসজ্জা থেকে শুরু করে লাউডস্পিকারে বাজা গানও যে একই ধাঁচে ঢালা হতে পারে, তা জানাই যেত না যদি না পশ্চিমবঙ্গে 'এশিয়ান পেইন্টস শারদ সম্মান' চালু না করতো। এদের ট্যাগ লাইন ছিল 'সুস্থ ভাবনার ছাপ, পরিশীলিত রুচির আঁচড়।' এই পুরস্কারের পাল্লায় পড়ে কোলকাতার দুর্গা নিত্য নতুন রূপে হাজির হতে লাগলো। তাই তো বদলে গেছে সাবেকি দুর্গাপূজার আনন্দ। দেবী মূর্তিতে এসেছে পরিবর্তন। পূজা মানে আরাধনা, এ কথাটা সকলেই জানেন। কিন্তু সেই আরাধ্য দেবীকে যখন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক পোশাক পরানো হয়, তখন সেখানে আরাধ্য বা নমস্য ভাবটা থাকে না। অনেকে দেবীকে আধুনিক পোশাক অর্থাৎ আনারকলি, স্কার্ট, লেহেঙ্গা পরাচ্ছেন। বাহন সিংহের পরিবর্তে মোটরসাইকেল দেওয়া হচ্ছে। ত্রিশূলের পরিবর্তে দেওয়া হচ্ছে মোবাইল ফোন।

আজকাল অধিকাংশ পূজায় মদ্যপান একটি রীতিতে পরিণত হয়েছে। আধুনিক গানের নামে এমন সব হিন্দি গান বাজানো হচ্ছে যা শুনে কেউ ভাবতে পারবে না, এটা পূজামণ্ডপ নাকি ডিজে প্রোগ্রাম! হিন্দি গান নিয়ে কোনো আপত্তি নেই। বরং এমন কোনো গান বাজানো উচিত নয়, যার ভাষা বা সুর পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এই বিষয়টিকে বড়রা অনেক সময় জাস্ট মজা বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন। তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, পূজার স্থান আরাধনার। ভক্তি এবং প্রার্থনার জায়গা। সেই পবিত্র স্থান কলুষিত করাকে মোটেই মজা হিসেবে নেওয়া ঠিক হবে না। একবার ভেবে দেখুন, আজকের মজা কালকে সমাজে বিরুপ প্রভাব ফেলবে। নতুন প্রজন্ম এমন বিরুপ চিন্তা নিয়ে বেড়ে উঠবে। তারা ধর্মীয় উৎসব আর ডিজে পার্টির পার্থক্য বুঝতে পারবে না।